মাকাসিদুশ শরিয়াহ

শরিয়ার উদ্দেশ্য ও কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্যের সমন্বয়

ড. ইউসুফ আল কারজাভি (রহ.)

ভাষান্তর : তারিক মাহমুদ

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

◈ পরিভাষা ১১
◈ ভূমিকা ১৩
◈ নতুন কিছু ফিকহ ১৬

ফিকহু মাকাসিদুশ শরিয়াহ ১৯
◈ শরিয়ার পরিচয় ১৯
◈ মাকাসিদুশ শরিয়ার অর্থ ২৪
◈ মহিলাদের উত্তরাধিকারী হওয়ার হিকমত ২৬
◈ মাকাসিদ বের করার উপায় ২৭
◈ পাঁচটি মৌলিক বিষয়ে মাকাসিদকে সীমাবদ্ধ করা ৩১

শরিয়ার উদ্দেশ্য এবং নসের সমন্বয় ৩৪

মৌলিক মাকাসিদ এবং প্রাসঙ্গিক নুসুস ৩৭
◈ মাকাসিদসংক্রান্ত তিনটি চিন্তাধারা ৩৭

প্রথম চিন্তাধারা : নব্য জাহেরি চিন্তাধারা ৪১
◈ নব্য জাহেরি চিন্তাধারা : মাকাসিদ এড়িয়ে নুসুস অধ্যয়ন ৪১
◈ নব্য জাহেরি চিন্তাধারার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ৪৬
◈ নব্য জাহেরি চিন্তাধারার ভিত্তি ৫২
◈ এই চিন্তাধারার পরিণাম ও ফলাফল ৫৬
◈ ইল্লত ও জনকল্যাণের রক্ষণাবেক্ষণের ওপর শরিয়ার ভিত্তি ৬৬
◈ শরয়ি বিধানের ক্ষেত্রে সাহাবিদের মাকাসিদ অনুসরণ ৬৮
◈ মুয়াজ (রা.) কর্তৃক শস্যের জাকাত মূল্যের মাধ্যমে নির্ধারণ ৬৮
◈ উমর (রা.) কর্তৃক রক্তপণের দায়িত্ব গোত্র থেকে দিওয়ানে স্থানান্তর ৭০

দ্বিতীয় চিন্তাধারা : নব্য মুয়াত্তিলা ৭২
◈ মাকাসিদ ও মাসালিহের নামে নুসুসকে রহিতকরণ ৭২
◈ নব্য মুয়াত্তিলা চিন্তাধারার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ৭৭
◈ নব্য মুয়াত্তিলা চিন্তাধারার ভিত্তি ৮১
- ওহির ওপর আকলকে প্রাধান্য দেওয়া ৮১
- উমর (রা.) কর্তৃক মাসালিহের নামে নুসুস এড়িয়ে যাওয়ার দাবি ৮৬
- মুয়াল্লাফাতুল কুলুবের অংশ বাতিল করার দাবি ৮৭

- উমর (রা.) কর্তৃক দুর্ভিক্ষের বছর চুরির হদ স্থগিত করা ৯১

◈ এই চিন্তাধারার ফলাফল ও অবস্থান ১০০

- অকাট্য নুসুস এড়িয়ে সন্দেহজনক বিষয় নিয়ে লেগে থাকা ১০১
- মাসলিহের নামে ইসলামের আরকান ও হুদুদের বিরোধিতা ১০৬
- একজন আইনবিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের সংশয় ১০৭
- অধ্যাপকের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব ১০৯
- তুফির কাছে অধ্যাপকের আবেদন ১১৪

তৃতীয় চিন্তাধারা : আল ওয়াসাতিয়্যাহ বা মধ্যমপন্থি চিন্তাধারা ১২০

◈ প্রাসঙ্গিক বিষয়ের নস ও সামগ্রিক মাকাসিদের সমন্বয় ১২০

◈ মধ্যমপন্থি চিন্তাধারার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ১২৮

◈ মধ্যমপন্থি চিন্তাধারার ভিত্তি ১৩৪

- মাকসিদ নিয়ে গবেষণা ১৩৪
- নসকে প্রেক্ষাপটের আলোকে উপলব্ধি ১৪০
- স্থির মাকাসিদ ও পরিবর্তনশীল উপকরণের মধ্যে পার্থক্যকরণ ১৫৩
- অপরিবর্তনীয় ও পরিবর্তনশীল বিষয়গুলো উপযুক্ততা অনুসারে গ্রহণ ১৭৯
- ইবাদত ও মুয়ামালাতের ক্ষেত্রে অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত ১৮২

মাকাসিদুশ শরিয়াহ

দ্বিতীয় যে কথাটি বলতে চাই তা হলো—'মাকাসিদুশ শরিয়াহ', যাকে কেন্দ্র করেই আমরা আজ পূর্ব ও পশ্চিমের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একত্রিত হয়েছি। এ সম্মেলন আমাদের যা নিয়ে কাজ করতে আহ্বান জানাচ্ছে। আমরা এখানে শরিয়াহ, মাকাসিদ ও ফিকহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

শরিয়ার পরিচয়

আল কামুস এবং তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ অনুযায়ী শরিয়াহ হলো—আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য দ্বীন হিসেবে যা বর্ণনা করেছেন অথবা যা কিছু দ্বীন হিসেবে প্রণয়ন করেছেন এবং তাঁর ইবাদত ও মুয়ামালাত হিসেবে যার আদেশ দিয়েছেন। যেমন : ইবাদতের মধ্যে সাওম, সালাত, হজ, জাকাত এবং সকল সৎকর্ম; মুয়ামালাতের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়, বিয়েশাদি ইত্যাদি।[১] আল্লাহ বলেন—

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ-

'অতঃপর (হে নবি!) আমি তোমাকে দ্বীনের সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি।'[২]

তার উৎপত্তি شرع الشيء থেকে মানে বর্ণনা করা, সুস্পষ্ট করা। অথবা তার উৎপত্তি الشرعة والشريعة থেকে। মানে যা থেকে অনবরত পানি প্রবাহিত হয়, যা শেষ হওয়ার নয় এবং তা পাওয়ার জন্য কোনো যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না।[৩]

রাগিব ইস্পাহানি তাঁর *মুফরাদাতিল কুরআন*-এ বলেন, শারউ মানে সুস্পষ্ট পথে পরিচালিত হওয়া। বলা হয়, আমি তাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করেছি। আর শরউ হলো ক্রিয়ামূল। পরে তা সুস্পষ্ট পথ হিসেবে বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

শিরউ, শারউ, শরিয়াহ ইলাহের দেখানো সঠিক পথের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

রাগিব ইস্পাহানি তাঁর কিতাবে প্রবীণদের মত উল্লেখ করেন, শরিয়াহকে শরিয়াহ বলা হয় পানির ঝরনার সাথে তার সামঞ্জস্যের কারণে। কারণ, যে শরিয়াহ গ্রহণ করে, প্রকৃতপক্ষে সে পরিতৃপ্ত ও পবিত্র হয়। তিনি বলেন, পরিতৃপ্তি বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি, জ্ঞানী ব্যক্তিরা যা বলেন—আমি পান করেছি, কিন্তু পরিতৃপ্ত হইনি। কিন্তু যখন আল্লাহ তায়ালাকে চিনলাম, কোনো কিছু পান করা ছাড়াই আমি পরিতৃপ্ত হয়ে গেছি। আর পবিত্রতা (তাতহহুর)[৪] বলতে বোঝাতে চেয়েছি, আল্লাহ তায়ালা যা বলেছেন—

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا-

---

[১] *আল কামুস*; *তাজুল উরুস*

[২] সূরা জাসিয়া : ১৮

[৩] *মুজামু আল ফাজিল কুরআনিল কারিম* : ২/১৩

[৪] ইমাম রাগিব ইস্পাহানি, *মুফরাদাতুল কুরআন*, পৃষ্ঠা : ৪৫০-৪৫১

‘হে নবিপরিবার! আল্লাহ চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূরীভূত করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।’[৫]

শিন-রা-আইন (شرع) মূলধাতু থেকে উৎপন্ন শব্দ বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ হিসেবে কুরআনুল কারিমে পাঁচবার ব্যবহৃত হয়েছে। অতীত কালবাচক ক্রিয়া হিসেবে আল্লাহ তায়ালার বাণী—

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِيٓ اَوۡحَيۡنَآ اِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهٖٓ اِبۡرٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ اَنۡ اَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ-

‘তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি নুহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার কাছে যে ওহি পাঠিয়েছি এবং ইবরাহিম, মুসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হলো— তোমরা দ্বীন কায়েম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না।’[৬]

আর এখানে আল্লাহ তায়ালা যা প্রবর্তন করেছেন, তা শরিয়ার মূলনীতি বা উসুল, শাখা-প্রশাখার বিষয় বা ফুরুউ নয়। এটা বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত, কর্মের সাথে নয়। আর এ কারণেই তার ওপর নুহ (আ.)-এর সময় থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ (সা.)-এর সময় পর্যন্ত সকল ইলাহি রিসালাত একমত। একই সূরায় আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের নিন্দা করতে গিয়ে ‘শিন-রা-আইন’ মাদ্দাহ ব্যবহার করেছেন—তারা দ্বীনি বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করার ক্ষমতা হাতে তুলে নিয়েছে। আল্লাহ তো তাদের এ অনুমতি দেননি। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

اَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمۡ يَاۡذَنۢ بِهِ اللّٰهُ-

‘তাদের কি এমন কোনো শরিক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?’[৭]

অতঃপর তারা আল্লাহ তায়ালার আদেশ ছাড়া হালাল গণ্য করেছে, হারাম গণ্য করেছে, ওয়াজিব করেছে, হুকুম রহিত করেছে।

এগুলো ছিল মাক্কি কুরআনে। আর মাদানি কুরআনে আল্লাহ তায়ালার বাণী হিসেবে সূরা মায়েদায় এসেছে—

لِكُلٍّ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةً وَمِنۡهَاجًا-

‘তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরিয়াহ ও স্পষ্ট পন্থা।’[৮]

শরিয়াহ অভিধানে তরিকা বা পথ অর্থে এসেছে, কুরআনুল কারিমেও ঠিক একই অর্থে এসেছে। সেটা হলো আল্লাহ তায়ালার বাণী—

ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الۡاَمۡرِ فَاتَّبِعۡهَا وَلَا تَتَّبِعۡ اَهۡوَآءَ الَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ-

---

[৫] সূরা আহজাব : ৩৩

[৬] সূরা শুরা : ১৩

[৭] সূরা শুরা : ১১

[৮] সূরা মায়েদা: ৪৮

‘তারপর আমি তোমাকে দ্বীনের এক বিশেষ বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তার অনুসরণ করো। আর যারা জানে না, তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না।’[৯]

লক্ষ করুন, শরিয়াহ শব্দটি কুরআনুল কারিমে শুধু এই স্থানেই ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা জাসিয়ায়। আর এটা মাক্কি সূরা। অর্থাৎ আহকামসংক্রান্ত আয়াত, বিধিবিধান ও এ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি নাজিলের আগে। আর তা নাজিল হয়েছে মদিনায়। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচারকরা এখানে একটি বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করে। তারা বলে, শরিয়াহ শব্দটি কুরআনুল কারিমে আইন প্রণয়ন বা কানুনের অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। সুতরাং তোমরা কেন ইসলামি আইন নিয়ে এত বেশি জোর দিচ্ছ? যেখানে কুরআন শব্দটি এ অর্থে ব্যবহারই করেনি।

বিষয়টি যদি শব্দের ব্যবহারের সাথে জড়িত হয়, তাহলে বলা যায়—কুরআনে আকিদা শব্দটির ব্যবহারই নেই; মাক্কি সূরাতেও না, মাদানি সূরাতেও না। তাহলে তোমরা কেন আকিদা বিষয়ে এত জোর দিচ্ছ?

একইভাবে বলা যায়, কুরআনে ফজিলত শব্দটির উল্লেখ নেই, তাহলে ফজিলত নিয়ে এত জোর দেওয়া হচ্ছে কেন?

এই বিভ্রান্তি খুব সহজ ও সুস্পষ্ট। বিবেকবান কেউ এটাকে জটিল মনে করে না। কারণ, কোন শব্দ ব্যবহার করা হলো সেটা মুখ্য কিছু নয়; বরং সে শব্দ ব্যবহার করে কী বোঝানো হয়েছে, সেটাই ধর্তব্য। কুরআন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক আহকাম/আইন ধারণ করে। যেমন—

- ইবাদতসংক্রান্ত আহকাম
- পারিবারিক বিষয়াদিসংক্রান্ত আহকাম
- প্রশাসনিক ও ব্যবসায়সংক্রান্ত আইন
- সম্পদ, কর/খাজনা, রাষ্ট্রীয় আয় ও ব্যয়সংক্রান্ত আইন
- অপরাধ ও শাস্তিসংক্রান্ত আইন, যেমন : হুদুদ, কিসাস, তাজির ইত্যাদি
- রাজনৈতিক বিষয়াবলি, শাসনের নীতি, শাসক ও জনগণের সম্পর্ক এবং শান্তি ও যুদ্ধাবস্থায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আইন
- জিহাদসংক্রান্ত বিধান

আর যে সকল আয়াত এ বিষয়গুলো ধারণ করে, তা পাঠকদের কাছে আয়াতুল আহকাম বা বিধানসংক্রান্ত আয়াত নামে পরিচিত।

শুধু এ আয়াতগুলো নিয়ে প্রাচীন ও আধুনিক স্কলাররা অনেক লেখালেখি করেছেন। যেমন : ইমাম আবু বকর আর-রাজির আল হানাফির[১০] *আহকামুল কুরআন*। ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবি আল মালেকির[১১] *আহকামুল কুরআন*। ইমাম শাফেয়িরও *আহকামুল কুরআন* নামে গ্রন্থ আছে, হাফেজ আবু বকর আল বায়হাকি আশ শাফেয়ি[১২] তা একত্রিত করেছেন। ইমাম সুয়ুতির[১৩] *আল*

---

[৯] সূরা জাসিয়া : ১৮

[১০] যিনি জাস্‌সাস নামে পরিচিত, মৃত্যু : ৩৭৯ হিজরি

[১১] মৃত্যু : ৫৪৩ হিজরি

[১২] মৃত্যু : ৪৫৮ হিজরি

ইকলিল ওয়া ইসতিম্বাতুত তানজিল। আর আধুনিক সময়ে শাইখ মুহাম্মাদ আলি আস-সায়েসর *আয়াতু তাফসিরিল আহকাম*।

আমাদের সময়ে 'শরিয়াহ' শব্দের ব্যবহার : আমরা আমাদের সময়ে উলামাদের শরিয়াহ শব্দটি নিম্নোক্ত দুটি বিষয়ের কোনো একটি বিষয়ে ব্যবহার করতে দেখি।

এক. আকিদা, নিদর্শন, আদব, আখলাক, আইনকানুন ও মুয়ামালাতসহ পুরো ইসলাম। অর্থাৎ, শরিয়াহ শব্দটিকে মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখার বিষয়, আকিদা ও আমল, তাত্ত্বিক ও বাস্তবিক সবকিছুর জন্য ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এটা তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের মতো ঈমান ও আকিদার বিষয়গুলোকে যেমন শামিল করে, তেমনই ইবাদত, মুয়ামালাত ও আচরণের মতো অন্যান্য যা কিছু ইসলাম নিয়ে এসেছে, কুরআন সুন্নাহ যা কিছু ধারণ করেছে এবং উলামাগণ আকিদা, শরিয়াহ ও আখলাক নামে যা কিছু ব্যাখ্যা করেছে, তার সবকিছুই শামিল করে।

দুই. দ্বীনের আমলগত বিধানাবলি তথা ইবাদত, মুয়ামালাত ইত্যাদি, যেমন : আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও তাঁর ইবাদত, পারিবারিক ও সামাজিক আইন, উম্মাহর বড়ো ও ছোটো ইস্যু, রাষ্ট্র ও শাসন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি। আর এটা হলো ইলমুল ফিকহের ক্ষেত্র, যাতে ইসলামি ফিকহের বিভিন্ন মাজহাব কাজ করে। আর এগুলো ইলমুল কালাম বা ইলমুত তাওহিদ তথা আকিদাশাস্ত্রের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। বলা হয়ে থাকে, ইসলাম হলো আকিদা ও শরিয়ার সমন্বয়।

আল আজহারসহ অন্য ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইসলামি শিক্ষার জন্য দুটি পৃথক ফ্যাকাল্টি প্রতিষ্ঠা করেছে। একটি হলো—উসুলুদ দ্বীন ফ্যাকাল্টি; যা আকিদাসংক্রান্ত বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট। অন্যটি শরিয়াহ ফ্যাকাল্টি। আর এটি ইসলামের শাখা-প্রশাখা তথা আমলগত বাস্তব কর্মের বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট।

আর এ কারণেই শরিয়ার পরিচিতি নির্ধারিত করা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আমরা যখন মাকাসিদুশ শরিয়াহ বলব, তখন কি আমাদের উদ্দেশ্য হবে শরিয়াহ আমলগত দিক বা শুধু ফিকহের মাকাসিদ, নাকি আকিদা ও ফিকহের সমষ্টি পুরো ইসলামের মাকাসিদ?

আর আমি যাকে প্রাধান্য দেবো তা হলো, আমরা এখানে পুরো ইসলামের মাকাসিদ উদ্দেশ্য করছি। আর উসুলবিদগণ, যারা মাকাসিদুশ শরিয়াহকে পাঁচটি মৌলিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ করেছেন, তারা আকিদাকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর এ কারণেই দ্বীনের সংরক্ষণকে তারা প্রথম জরুরি বিষয় করেছেন। আর আকিদা হচ্ছে দ্বীনের মূল স্তম্ভ ও ভিত্তির পুরোটুকু।

মাকাসিদুশ শরিয়ার অর্থ

আর মাকাসিদুশ শরিয়ার অর্থ হচ্ছে—সেই সকল চূড়ান্ত উদ্দেশ্য, কুরআন-সুন্নাহর উক্তিসমূহের আদেশ, নিষেধ ও মুবাহ দ্বারা যা হাসিল করতে চাওয়া হয়। আর বিভিন্ন বিষয়ের আহকাম

---

[১৩] মৃত্যু : ৯১১ হিজরি

মুকাল্লিফদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সংঘবদ্ধ জীবন এবং উম্মাহর মাঝে যা বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করে।

আর মাকাসিদকে বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক আহকামসমূহের পেছনে যে হিকমত আছে, তার অর্থেও ব্যবহার করা যায়। বান্দার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে জারি করা প্রত্যেক হুকুমের পেছনে হিকমত রয়েছে। যে জানার, সে তা জানতে পারে। আর যে জানার নয়, সে তা জানতে পারে না। কারণ, আল্লাহ তায়ালা অকারণে ও অনর্থক কোনো আইন প্রবর্তন থেকে পবিত্র। তিনি পবিত্র হিকমতের বিপরীত আইন প্রবর্তন থেকেও।

মাকাসিদ দ্বারা সে ইল্লত উদ্দেশ্য নয়, কিয়াসের গবেষণায় উসুলবিদগণ যা বর্ণনা করেছেন। ইল্লতের সংজ্ঞায় তারা বলেন—হুকুমের সাথে সংশ্লিষ্ট নিয়মতান্ত্রিক একটি বাহ্যিক গুণের নাম ইল্লত। আর তা হচ্ছে হুকুমের কারণ। মাকসাদ নয়। যেমন : তারা সফরে নামাজকে কসর করা, রমজানে রোজা ভঙ্গ করা ইত্যাদি রুখসতের ব্যাপারে বলেন—এখানে ইল্লত হচ্ছে সফর। কারণ, সফর অবস্থায় ব্যক্তি এমন কষ্টের সম্মুখীন হয়, স্বাভাবিক অবস্থায় যার সম্মুখীন সে হয় না। অতএব, এই কষ্টের সম্মুখীন হওয়া হচ্ছে রুখসতের হিকমত। ইল্লত নয়। ইল্লত হচ্ছে সফর করা।

তারা হুকুমকে হিকমতের সাথে সম্পৃক্ত করেনি। কারণ, তা নির্ণয় করা খুব কঠিন। ফলে তার ওপর নির্ভর করে হুকুম এলে তা জটিলতা, হতবুদ্ধিতা ও অসুবিধার কারণ হবে। যদি বলা হয়, মুসাফিরের জন্য সালাত কসর করা, দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্র করা এবং রোজা ভাঙার অনুমতি রয়েছে; যদি সে কষ্ট অনুভব করে। তাহলে এক্ষেত্রে মানুষের মাঝে বিভিন্ন ধরনের বিভক্তি দেখা যাবে। কারও ক্ষেত্রে দেখা যাবে—প্রচণ্ড কষ্ট হওয়ার পরও সে খোদাভীরুতার কারণে বলবে, আমার মোটেই কষ্ট হচ্ছে না। আবার কারও সামান্য কষ্ট না হলেও সে বলবে, আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে।

মজার বিষয় হচ্ছে, আমাদের ফকিহগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিকমত বিবেচনা না করে ইল্লত বিবেচনা করেছেন। যেমন : মুসাফিরের সাওমের ক্ষেত্রে ইল্লত অর্থাৎ সফরকে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু অসুস্থ রোগীর সিয়ামের ক্ষেত্রে তারা হিকমত বিবেচনা করেছেন, ইল্লত নয়। তাই তারা বলেন না, যেকোনো রোগ হলেই রোগী সাওম ছাড়তে পারবে, ঠিক যেমন মুসাফির যেকোনো সফরে সাওম ছাড়তে পারে। তারা বরং শুধু সেই অসুস্থতাকে বিবেচনা করেছেন, যা সিয়ামের ফলে বেড়ে যায় বা সিয়ামের কারণে তা থেকে আরোগ্য পেতে দেরি হয়।

আমি মনে করি, যদি হিকমত সুস্পষ্ট হয়, তবে হুকুমের জন্য হিকমতের ওপর নির্ভর করা উচিত। আরও মনে করি, মাকাসিদকে মনে করা যায় : হিকমাতুশ শরিয়াহ বা হুকুমের পেছনে থাকা চূড়ান্ত কারণ।

হিকমত কখনো হয় স্পষ্ট ও প্রকাশ্য, সাধারণ আকল সামান্য চিন্তা করলেই তা উপলব্ধি করতে পারে। যেমন : মৃত নিকটাত্মীয়ের রেখে যাওয়া সম্পদে বালেগ পুরুষদের সাথে নারী ও শিশুদের উত্তরাধিকারী হওয়া। এ বিধানটি আরবদের ওয়ারিশি সম্পদ বণ্টনের নীতির খেলাফ ছিল। তারা শুধু অস্ত্র ধরতে এবং কাবিলা বা গোত্রের প্রতিরক্ষা করতে সক্ষমদের উত্তরাধিকার সম্পদে ভাগ

দিত। নারীদের উত্তরাধিকার সম্পদে কোনো ভাগ ছিল না। কারণ, যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষায় তাদের কোনো অংশগ্রহণ ছিল না। একইভাবে বাচ্চা ছেলেসন্তানও উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। কারণ তারা কাবিলা, অন্য কোনো পক্ষ বা নিজেদের সুরক্ষা দিতে কাজ করত না।

অতঃপর কুরআন এলো এবং বাবা, মা, স্ত্রী, পরিজন, ঔরসজাত ও নিকটাত্মীয়দের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলো। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ ۪ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا-

‘মাতা-পিতা এবং আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রয়েছে; আর মাতা-পিতা এবং আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে; তা অল্পই হোক আর বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।’[১৪]

আর এটাই সুবিচার। কারণ, কন্যাসন্তান ঠিক সেভাবেই পিতা-মাতার সাথে সম্পর্কযুক্ত, যেমন তার সহোদর ভাই পিতা-মাতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাহলে কেন তার ভাই উত্তরাধিকারী হবে, আর সে বঞ্চিত হবে? মেয়ে মৃত্যুবরণ করলে পিতা তার উত্তরাধিকারী হয়, তাহলে পিতা মৃত্যুবরণ করলে সে হবে না কেন? স্বামী স্ত্রীর উত্তরাধিকারী হয়, তাহলে স্ত্রী কেন হবে না?

মহিলাদের উত্তরাধিকারী হওয়ার হিকমত

কিন্তু কন্যাসন্তানের উত্তরাধিকার তার সহোদর ভাইয়ের অর্ধেক হওয়ার হিকমত বা শরয়ি মাকসাদ কখনো কখনো (চিন্তাশীল লোক ব্যতীত) আরও জন্য অস্পষ্ট হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ-

‘আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ।’[১৫]

কিছু কিছু মানুষ এ বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। তারা প্রশ্ন উত্তোলন করে—কেন পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে? অথচ তারা দুজনই পরিপূর্ণ সত্তার অধিকারী মানুষ। তাদের দুজনই একই মূলের দুটি শাখা। দুজনই সরাসরি সন্তান এবং তাদের নৈকট্য/দূরত্বও একই। কিন্তু যিনি আহকামগুলোর একটিকে অন্যগুলোর সাথে মিলিয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, তার কাছে এটি স্পষ্ট—বাবা-মায়ের সম্পত্তিতে পুত্র ও কন্যাসন্তানের অংশ ভিন্ন হওয়ার কারণ তাদের দুজনের ওপর দায়িত্ব, কর্তব্য ও আর্থিক বোঝার বিভিন্নতা।

যদি আমরা ধরি, একজন বাবা মারা গেলেন আর তিনি এক পুত্র, এক কন্যা ও ১৫ লাখ টাকা রেখে গেলেন। তাহলে পুত্র ১০ এবং কন্যা ৫ লাখ উত্তরাধিকার পাবে। কিন্তু পুত্র যদি বিবাহ করতে ইচ্ছে করে, আমরা তার নববধূর জন্য আড়াই লাখ টাকা মোহর নির্ধারণ করি। তাহলে

---

[১৪] সূরা নিসা : ৭

[১৫] সূরা নিসা : ১১

তার উত্তরাধিকার সম্পদ কমে সাড়ে সাত লাখে এসে দাঁড়াবে। আর কন্যার যদি বিবাহ হয় এবং আমরা তার ভাইয়ের তার জন্য আড়াই লাখ মোহর ধার্য করি, তাহলে তার সম্পদ বেড়ে সাড়ে সাত লাখে গিয়ে পৌঁছাবে। এভাবেই তাদের সম্পদ সমান সমান হয়ে যাবে।

তা ছাড়া আমরা যদি পুত্রের ওপর বাড়ি নির্মাণ, ওলিমা, নববধূর জন্য উপহার ইত্যাদি বিভিন্ন খরচ চাপিয়ে দিই, তাহলে তার সম্পদের ঘাটতি আরও বেড়ে যাবে। বিপরীতে তার বোনের সম্পদ উপহার ইত্যাদি পেয়ে আরও বেড়ে যাবে। এ কারণে অনেক গবেষক মনে করেন, ইসলামি শরিয়াহ মিরাসের ক্ষেত্রে কন্যাসন্তানকে বরং একটু বেশিই দিয়েছে।[১৬]

মাকাসিদ বের করার উপায়

হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামিদ আল গাজালির আবিষ্কৃত পদ্ধতি ছাড়া কি মাকাসিদুশ শরিয়াহ বের করার অন্য কোনো উপায় রয়েছে? তিনি তাঁর কিতাব *আল মুসতাশফায়* কল্পিত মূলনীতি ধরে শরিয়ার মাকসাদের সন্ধানে আলোচনা করে এই বস্তুনিষ্ঠ উপসংহারে পৌঁছেছেন। উপসংহারে তিনি মাকসিদ তত্ত্বের মূলভিত্তি আবিষ্কার করেন। যুগের পর যুগ ধরে ইসলামি চিন্তাধারা যাকে আঁকড়ে ধরে আছে। তিনি মাকাসিদকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেন—জরুরিয়াত, হাজিয়াত, তাহসিনাত (জরুরি, প্রয়োজনীয় ও শোভাবর্ধক)। তার আবিষ্কৃত পদ্ধতি ভিন্ন কোনো তরিকায় কি মাকাসিদ বের করার সুযোগ আছে?

আমি ভিন্ন কোনো পদ্ধতিতে মাকাসিদ বের করতে কোনো বাধা দেখি না। আমি মনে করি, আমরা আরও কিছু পদ্ধতিতে মাকাসিদুশ শরিয়াহ বের করতে পারি।

ক. কুরআন, সুন্নাহর যে সকল নুসুসের মাঝে ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন, যাতে আমরা তা থেকে ইসলামে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানতে পারি। যেমন : সূরা হাদিদে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ-

‘নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদের স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাঁদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদণ্ড নাজিল করেছি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।’[১৭]

এ আয়াত আমাদের ন্যায়নিষ্ঠতার মূল্যবোধ বর্ণনা করছে। এই ন্যায়নিষ্ঠতাই হচ্ছে সমস্ত আসমানি শরিয়ার মূল মাকসাদ। এ আয়াতে মাকসাদ বর্ণনা করা হয়েছে ‘লামুত তালিল’ বা ব্যাখ্যাকারী লামের মাধ্যমে।

আল্লাহ তায়ালার বাণী—

مَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ -

---

[১৬] সালাহ উদ্দিন সুলতান, *ইমতিয়াজুল মারআতি আলার রজুলি ফিল মিরাসি ওয়ান নাফকাতি*

[১৭] সূরা হাদিদ : ২৫

‘আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে ফাই হিসেবে যা দিয়েছেন তা আল্লাহর, রাসূলের, আত্মীয়স্বজনদের, এতিমদের, মিসকিন ও মুসাফিরদের এটি এজন্য যে, যাতে ধনসম্পদ তোমাদের মধ্যকার বিত্তশালীদের মাঝেই কেবল আবর্তিত না থাকে।’[১৮]

সুতরাং এই দরিদ্র গোষ্ঠী, বিশেষ করে অভাবী ও প্রয়োজনগ্রস্তদের মধ্যে ফাইয়ের সম্পদ বণ্টন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—সম্পদ থেকে লাভবান হওয়ার নীতি সম্প্রসারণ। যাতে ধনীরা একচেটিয়াভাবে তা অধিকার করে নিতে না পারে এবং সম্পদ কেবল তাদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়; যেমনটা পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য। পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো—সম্পদ কেবল ধনীদের হাতেই আবর্তিত হতে থাকবে।

এ আয়াতে মাকাসিদকে হরফে তালিল كي (কাই)-এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে।

তালিলের হরফ ছাড়াও ভিন্নভাবে তালিল করা যায়। যেমন : রাসূল (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলা আল্লাহ তায়ালার বাণী—

وَمَآ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعٰلَمِيۡنَ-

‘আর আপনাকে আমরা পাঠিয়েছি বিশ্ববাসীর প্রতি রহমত হিসেবে।’[১৯]

এখানে তালিল রয়েছে আল্লাহর বাণী ‘আপনাকে পাঠানো হয়েছে সকল সৃষ্টিকুলের মাঝে রহমত ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য’-এর মাঝে।

আল্লাহ তায়ালার বাণী—

وَلَكُمۡ فِى الۡقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰۤاُولِى الۡاَلۡبَابِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُوۡنَ-

‘হে জ্ঞানবান লোকেরা! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো।’[২০]

এখানে তালিল রয়েছে আল্লাহ তায়ালার বাণী ‘আমরা কিসাসের বিধান করেছি জীবনের নিরাপত্তার জন্য’ কথার মধ্যে। আমরা দেখতে পাই— কুরআন নিজেই সালাত, সিয়াম, জাকাত হজ ইত্যাদি ইবাদতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছে।

খ. বিভিন্ন বিষয়ের হুকুমসমূহের সামগ্রিক অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ, গভীর মনোনিবেশ এবং সেগুলোর একেকটিকে অন্যটির সাথে মেলানো, যাতে আমরা এ সামগ্রিক অধ্যয়ন থেকে সবগুলো বিষয়ে প্রযোজ্য এমন একটি মাকসাদ বা কয়েকটি মাকসাদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি, শরিয়াহপ্রণেতা যা আহকামগুলো প্রণয়নের দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন।

ইমাম গাজালি এ পদ্ধতির পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। আর ইমাম শাতেবি তা অনুসরণ এবং বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

---

[১৮] সূরা হাশর : ৭

[১৯] সূরা আম্বিয়া : ১০৭

[২০] সূরা বাকারা : ১৭৯